জুলাই বিপ্লবের দিনলিপি

২৪-এর ছাত্র আন্দোলন থেকে শুরু করে গণঅভ্যুত্থানে
ছাত্র-জনতার ওপর নৃশংসতার প্রামাণিক গ্রন্থ

মুনতাসির বিল্লাহ

কেন্দ্রবিন্দু

লেখকের জবানবন্দি...

আন্দোলনে যাওয়ার প্রথম দিন থেকেই লিখে রেখেছিলাম খণ্ড খণ্ড ঘটনাগুলো। দৌড়াদৌড়ি আর বন্দুকের নলের সামনে থেকে জীবন নিয়ে পালানোর সময়ও সুযোগ পেলেই মূল ঘটনাগুলো লিখে ডট ডট দিয়ে আবার অন্য ঘটনা লিখতাম। তখন থেকেই ইচ্ছে ছিল ঘটে যাওয়া এইসব নৃশংসতা প্রকাশ্যে আনব, যেদিনই হোক। পাঠকের কাছে এই সত্যতা তুলে ধরব; যেন এই ইতিহাস কেউ ভুলে না যায়, বিকৃত না হয়। দেশ দ্বিতীয়বার স্বাধীন হলো। মত প্রকাশের স্বাধীনতাও পেলাম। এখন হয়তো মত প্রকাশ করতে, সত্য বলতে আর কোনো ভয় নেই।

৫ তারিখের পর দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করল। মাথা থেকে আগের বিভিন্ন ভয় কাটিয়ে একটা যন্ত্রণা নিয়ে ঘুরছিলাম, কবে এইসব নৃশংস ঘটনাগুলো লিখব। কবে এই নৃশংস ইতিহাস সবাই জানবে। সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আশায় নোটপ্যাডে টুকে রাখা মূল ঘটনাগুলোর বিস্তারিত লিখতে বসলাম; আমার সাথে যেখানে যা হয়েছে, কখন কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছি, চোখের সামনে যা দেখেছি সবই; চারপাশের অবস্থা। এই ঘটনাগুলো যখন বিস্তারিতভাবে লেখা শেষ করে প্রাথমিক একটা কাঠামো দাঁড় করালাম, তখন অন্য এক যন্ত্রণায় পড়লাম— চোখের ঘুম হারাম হয়ে গেল। রাতে কোনোভাবেই ঘুম আসত না। ঘুমোতে পারতাম না। প্রতিটা রাতে কোনো এক অজানা অশান্তিতে শুধু এপাশ-ওপাশ করেছি। চোখ বন্ধ করলেই বা মস্তিষ্ক সব চিন্তা থেকে মুক্ত হলেই যাত্রাবাড়ী ঘটে যাওয়া ওইসব নৃশংসতা চোখে ভেসে ওঠে। আন্দোলনের চিত্রগুলো ভেসে ওঠে। গুলি, গ্রেনেড আর শুয়োর তাড়ানো স্লোগানগুলো কানে বেজে ওঠে। আহতদের করুণ আর্তচিৎকারে কান ভরে যায়। গুলিবিদ্ধ হয়ে শিশিরসিক্ত কামিনী ফুলের পাপড়ির মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকা লাশ দেখি; বিশেষ

করে ৫ তারিখে যাত্রাবাড়ী থানার সামনে ঘটে যাওয়া ওই নৃশংসতা! এভাবে অশান্তিতে আর নির্ঘুমে কত রাত পার হয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই!

আমি এসব থেকে মুক্তি পেতে চাই, ঠিক যেমন মুক্তি পেয়েছি স্বাধীনের পর দরজায় টোকা দেওয়ার আতঙ্ক থেকে বা বাসায় খোঁজ নেওয়ার ভয় থেকে। কারণ, আমি আন্দোলনে সক্রিয় ছিলাম এ বিষয়টা বাসার আশেপাশের অনেকেই দেখেছে। তারপর পাণ্ডুলিপি আকারে তৈরি করা এই খসড়াটা আরও সুন্দর ঝরঝরে গদ্যে সব ঘটনার বর্ণনা সুনিপুণভাবে তুলে আনার পর এসব থেকে মুক্তি পেয়েছি; যা এখন আপনার হাতে।

আমি ক্ষমাপ্রার্থী, আপনাকে এই নৃশংসতার বর্ণনা পড়িয়ে অন্যমনস্ক করায়। আপনার হৃদয় ভারাক্রান্ত করায়। একবার ভাবুন, আপনি পড়ছেন আর আমি দেখেছি, শুনেছি! আমার সাথে ঘটেছে!

প্রকাশক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ, ২৪-এর বিপ্লবে ছাত্র-জনতার ওপর নৃশংসতার একটা প্রামাণিক গ্রন্থ হিশাবে ইতিহাস বয়ান করা এই কাজটা মলাটবদ্ধ করতে সহযোগিতা করার জন্য।

মুনতাসির বিল্লাহ
ঢাকা
আঠারো আট চব্বিশ

সূচিপত্র

বিপ্লবী রক্ত কখনো নীরব থাকে না ৯
রক্তাক্ত এক সন্ধ্যার গল্প ২২
রক্তখেকো ক্ষমতাধর নরপিশাচদের নৃশংসতা ৪১
কারফিউ যেন ৭১-এর দিনকাল ৬১
জালিমের গুলিতে রক্তাক্ত রিকশাচালক ৭১
অস্বাভাবিক শহরে এক সকাল..... ৭৩
ছোপ ছোপ রক্ত ও এক দলা ঘিলু..... ৭৬
ক্ষমতায় টিকে থাকার শেষ কামড় কত নৃশংস!..... ৮৩
বিধ্বস্ত নগরীর হৃদয়বিদারক দৃশ্য ১১৬
স্বার্থান্বেষীদের লুটতরাজ ১২৩

উপসংহার

খুনি যখন বিচার চেয়ে কান্না করে ১২৮
শাসকের গলায় জুতার মালা..... ১৩৬
আন্দোলনের বারুদ বারুদ স্লোগান..... ১৪২
আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস..... ১৫০

বিপ্লবী রক্ত কখনো নীরব থাকে না

আমি শাপলার বিপ্লবী। সর্বদা জুলুম আর অন্যায়ের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছি। এই জুলুমের বিপক্ষে না দাঁড়িয়ে ঘরে থাকতে পারি নি। আপিস করতে পারি নি। অন্যায়, জুলুম আমাকে তার বিপক্ষে দাঁড়াতে বাধ্য করেছে। কারণ, স্বৈরাচারের গদিতে প্রথম যে পেরেকটা হেফাজতের ব্যানারে ২০১৩-এর ৫ মে মাদরাসার ছাত্র আর ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা ঠুকেছিল, তার শেষ পেরেকটা ঠুকছে কোটা আন্দোলন থেকে শুরু করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন তারপর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান।

আমি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধেও দাঁড়িয়েছি। আহত ভাইদের সেবা করেছি। তাদের কাঁধে নিয়ে হাসপাতালে ছুটেছি। রক্তাক্ত লাশ টেনে শরীর, জামা রক্তাক্ত করেছি। শাপলার মতো চোখের সামনে গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যেতে দেখেছি অনেককে। ছটফট করতে করতে নিস্তেজ হতেও দেখেছি। কী সুন্দর চেহারা প্রাণবায়ু উড়ে গিয়ে হলুদাভ বর্ণ হয়ে যেতে দেখেছি।

সতেরো সাত চব্বিশ

আপিস বন্ধ। সারা দিন বাসায় বসে আছি। দুপুরের পর শনির আখড়া থেকে কাজলা পর্যন্ত কোটা বিরোধী আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে গেলাম। আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশের জন্য। পরিস্থিতি জানার জন্য। এখানে আন্দোলনরত ছাত্ররা কোনো হামলার শিকার হয়েছে কি না বা কারও সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়েছে কি না। কারণ, সংবাদমাধ্যমে শোনা যাচ্ছে, দেশের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ, আওয়ামী লীগ আর তার অঙ্গসংগঠনগুলো শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর হামলা করছে।

বাসা থেকে নেমে মেইন রোডে উঠলাম। রাস্তা সম্পূর্ণ ফাঁকা। কোনো গাড়ি চলে না। মাঝে মাঝে শাঁ-শাঁ করে দু-একটা অ্যাম্বুলেন্স,

প্রাইভেটকার আর বাইক ছুটে আসছে সাউনবোর্ডের দিকে থেকে; দুয়েকটা সিএনজি, সাথে রিকশাও। কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স আর বিশেষ কারণবশত প্রাইভেট ছাড়া মেইন রোড দিয়ে আর কোনো যানবাহনকে সামনে যেতে দিচ্ছে না।

সূর্য তেতে উঠেছে। চারদিকে খাঁখাঁ রোদ। এতটুকু হেঁটেই শরীর ঘেমে গেছে। রাস্তায় উঠে শনির আখড়া ফুটওভারব্রিজের নিচে বা দানিয়া কলেজের সামনে আন্দোলনরত কোনো ছাত্রদের দেখলাম না। সবাই সালমান হাসপাতালের সামনে থেকে শুরু করে কাজলা ব্রিজের নিচে দাঁড়িয়ে বা বসে আছে। হাঁটতে হাঁটতে ব্রিজের নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছাত্র-ছাত্রীরা সড়ক অবরোধ করে স্লোগান দিচ্ছে,

তুমি কে আমি কে?
রাজাকার রাজাকার!!
কে বলেছে কে বলেছে?
সরকার সরকার!!

চেয়েছিলাম অধিকার,
হয়ে গেলাম রাজাকার!

স্লোগানের আসরগুলো পেরিয়ে আরও সামনে গেলাম। রাস্তার পাশে হাফেজ নেসার সাহেবের মাদরাসার নিচেই একদল পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, হয়তো ওপর থেকে অর্ডারের অপেক্ষায়। অর্ডার পেলেই রাস্তা থেকে আন্দোলনকারীদের হটিয়ে দেবে বা ধাওয়া করবে অথবা ছাত্র-ছাত্রীরা কোনো ভাঙচুর বা জ্বালাও-পোড়াও না করে সেজন্য পাহারা দিচ্ছে।

এই দৃশ্যের ৩০ মিনিট যেতে না যেতেই দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের দল ছররা গুলি আর টিয়ারশেল ছুড়ে আন্দোলনকারীদের ধাওয়া শুরু করল। সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হলো, টিয়ারশেলের বিষাক্ত ধোঁয়া আর ছররা গুলি থেকে আত্মরক্ষার জন্য। আমিও

পেছনের দিকে দৌড়ানো শুরু করলাম। কারণ, দাঁড়িয়ে থাকলে গুলিবিদ্ধ ত হবই, সাথে পুলিশের হাতে পড়লে যেতে হবে থানা অবধি। তারপর জেল খাটো বা মামলা-মোকদ্দমা করতে করতে জীবন থেকে চলে যাবে বছর বা কয়েক মাস। সাথে টাকার গচ্চা ত আছেই। যেটা বাংলাদেশের নিত্যদিনকার ঘটনা।

মেইন রোডের পাশ দিয়ে দৌড়িয়ে সালমান হাসপাতাল পার হয়ে ডাস্টবিনের কাছে আসা মাত্রই বাম পাশে একটা টিয়ারশেল এসে পড়ল। এখন টিয়ারশেলের বিষাক্ত ধোঁয়া থেকে বাঁচতে মেইন রোডে উঠা ঝুঁকিপূর্ণ সেজন্য ওই ধোঁয়ার মধ্য দিয়েই পার হলাম। মাস্ক পরা থাকলেও ধোঁয়া নাকেমুখে ঢুকে বিষক্রিয়ার কারণে নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম। একদম বন্ধ না হলেও নিজে থেকে নিশ্বাস নেওয়া বন্ধ করতে হচ্ছে। কারণ, নিশ্বাস নিলে নাক-মুখ দিয়ে টিয়ারশেলের বিষাক্ত ধোঁয়া ঢুকে আরও ভয়াবহ অবস্থা হচ্ছে। এতটুকুতেই গলার ভেতর কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। নিশ্বাস নিতে গেলে জ্বলছে। মনে হচ্ছে কে যেন কণ্ঠনালি চেপে ধরে নিশ্বাস আটকে রেখেছে। চোখ থেকে অনবরত পানি পড়ে চোখও বন্ধ। ইচ্ছা করলেও বিষাক্ত গ্যাসের তীব্রতায় তাকাতে পারছি না। শেষ পর্যন্ত নিশ্বাস বন্ধ রেখেই দৌড়ালাম, নিরাপদ দূরত্বে যাওয়ার জন্য। কিছুদূর এগোতেই আরেকটা এসে পড়ল। মাস্কে আর মানাচ্ছে না দেখে সাথে সাথে ডান হাত দিয়ে নাকমুখ চেপে ধরে দরদর করে পানি পড়তে থাকা ডান চোখ কোনোমতে খোলা রেখে ঝাপসা চোখেই দৌড়ে মেলেনিয়াম নার্সিং কলেজের গলিতে ঢুকলাম।

গলিতে আমার আগেই আরও কয়েকজন এসে জড়ো হয়েছে। টিয়ারশেলের বিষাক্ততা কমানোর জন্য কেউ কেউ চোখে-মুখে পানি দিচ্ছে। দৌড়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে কয়েক বার পানি চাইলাম, খাব আর চোখে-মুখে দেবো সেজন্য। হয়তো সবার হাতের পানি শেষ। কারও কাছে পেলাম না। বিষের প্রতিক্রিয়ায় অবস্থা আরও খারাপ হলো। দাঁড়াতে না পেরে পেছনের দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়লাম। মনে হচ্ছে এখনি নিশ্বাস বন্ধ হয়ে প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবে।

নিশ্বাস নিতে পারছি না। কেমন যেন গলা কামড়ে ধরে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বসে থেকে শেষ কয়েক বার পানি... পানি... বলে ঝাপসা চোখেই চারপাশে তাকালাম। সবাই নিজেকে আর পরিচিতজনকে নিয়ে ব্যস্ত। আমার দিকে কোনো হাত এগিয়ে এলো না। এই করুণ মুহূর্তে নিজেকে খুব অসহায় মনে হলো। মনে পড়ল ৯ বছর আগে ১৩ সালের ৫ মের শেষ বিকেলের কথা। যেদিন বায়তুল মুকাররমের উত্তর গেটের সামনে থেকে টিয়ারশেলের গ্যাসের সম্মুখীন হয়ে দৌড়ে মসজিদের ভেতরে গিয়েছিলাম। সেদিন চারপাশ থেকে রোমাল দিয়ে মুখঢাকা কিছু ভাইয়েরা গ্যাসলাইটের আগুন জ্বেলে আর পানি হাতে এগিয়ে এলেও আজ কেউ আসে নি। তবুও হাল না ছেড়ে স্বাভাবিক হওয়ার শেষ চেষ্টা হিশেবে চোখ বন্ধ করে মুখের মাস্ক খুলে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে চেষ্টা করলাম। সেদিনও মুখে মাস্ক ছিল। মাস্ক খুলে চোখে-মুখে গ্যাস লাইটের আগুনের ভাপ নিয়েছিলাম। আজকে মাস্ক খুলে বাহিরের হাওয়া নিয়ে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছি। কিছুক্ষণ পর আন্দোলনকারী কয়েকজন আশপাশ থেকে কাগজ জড়ো করে আগুন জ্বালাল। কোনোরকম উঠে আগুনের কাছে মুখ নিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নিলাম, আগুনের তাপে গ্যাসের বিষাক্ততা কাটানোর জন্য। কিছুটা স্বাভাবিক হতে না হতেই পুলিশ আবার ধাওয়া করে টিয়ারশেল নিক্ষেপ করল, ১৩ সালে বায়তুল মোকাররমের সিঁড়িতে উঠে ভেতরেও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে ধাওয়া করার মতো।

দ্বিতীয় বার ধাওয়া করার পর গলি থেকে বের হয়ে দৌড়ানোর সময় আবার টিয়ারশেল এসে পড়ল গলির মুখে। সাথে ছররা গুলি। বেয়ারিংয়ের মধ্যে যে লোহার গোল বল থাকে সেসব। ওই অবস্থায় গলি থেকে বের হয়ে দৌড়ে দনিয়া কলেজ পেছনে ফেলে বর্ণমালা স্কুলের গলিতে ঢুকলাম। গলি থেকে বের হয়ে দৌড়ানোর সময় হালকা ব্যথা অনুভব হয়ে কয়েকটা ছররা গুলি এসে পিঠে লাগল। নিশ্বাস তখনও স্বাভাবিক না। বিষাক্ত গ্যাসের কারণে চোখ জ্বলতে থাকার পাশাপাশি এখনো দরদর করে পানি পড়ছে। পুলিশ আরও

সামনে এগোলো। সাথে গ্রেনেড, ছররা গুলি আর টিয়ারশেল নিক্ষেপ ত আছেই।

কিছুক্ষণ পর বর্ণমালার গলি থেকে বের হয়ে দনিয়া কলেজের সামনে মেইন রোডে উঠলাম। পুলিশ আমাদের পিছ পিছ ফুটওভার ব্রিজের নিচ থেকে আরও একটু এগিয়ে এসে রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে এলোপাথাড়িভাবে চারপাশে একের পর এক ছররা গুলি আর টিয়ারশেল ছুড়ছে। সাথে উচ্চ আওয়াজে কী যেন বলছে। চিল্লানোর আওয়াজ শুনলেও কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। (আমার কাছে এই দৃশ্যের ভিডিয়ো ফুটেজ ধারণ করা আছে।)

শুরু হলো শনির আখড়া, কাজলা, যাত্রাবাড়ী আর রায়েরবাগে পুলিশি হামলার সূত্রপাত। সামনে দেখব এই হামলার বিরুদ্ধে ছাত্ররা ভাঙচুর আর জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন শুরু করবে। সংঘর্ষে জড়াবে পুলিশ আর আওয়ামী সন্ত্রাসীদের সাথে।

মেইন রোডে কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর নেমে পাশের রাস্তা দিয়ে ঢালের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। ঢালেরও ওপর থাকা আন্দোলনরত ছাত্রদের সাথে মিশতে। কারণ, এখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ না। সরাসরি গুলি করলে বুকে এসে লাগবে। দৌড়িয়ে পালাতে গেলেও পিঠে লাগবে। আশেপাশে এমন কিছুও নেই, যার আড়ালে দাঁড়ব। হাঁটতে হাঁটতে আয়েশা মোশাররফ সুপার মার্কেটের সামনে আসার সাথে সাথে পেছনের সবাই দৌড়াদৌড়ি করে পাশের গলিতে ঢুকতে শুরু করল—গুলি করছে, গুলি করছে বলতে বলতে। তাদের কথা শেষ হতে না হতেই চারপাশের টিন আর স্টিলে ছররা গুলি এসে আছড়ে পড়ার শব্দও শুনলাম। দৌড়ে গলির ভেতরে গেলাম। একবার মনে হলো, এদিক দিয়ে বাসায় চলে যাব; ভয়ে তেমন একটা মানশিকতা তৈরি হয়েছিল। ৫০ মিটার ভেতরে যাওয়ার পর দাঁড়িয়ে গেলাম। অপরিচিত গলি সেজন্য যাওয়ার সাহস হলো না। যদি এদিকেই ফিরতে হয় আর পুলিশের সামনে পড়ি সেই ভয়ে। ভাবলাম, তার চেয়ে পরিবেশ শান্ত হলে গলি থেকে বের হয়ে রায়েরবাগের দিকে গেলেও নিরাপদ থাকব। বাসায় ফিরতে রাত

হলেও নিরাপদে যেতে পারব। পুলিশের সামনে পড়ার বা গুলি লাগার কোনো আশঙ্কা থাকবে না। তখনও জানি না, সময়ের সাথে সাথে রক্তে আগুন লেগে বিপ্লবী হয়ে উঠব, আন্দোলনের সম্মুখযুদ্ধের যোদ্ধা হয়ে উঠব; ১৩-এর হেফাজতের নাস্তিক-বিরোধী আন্দোলনের মতো। সেদিনও দুপুরে দিকে সংঘর্ষ আর গোলাগুলির আওয়াজ শুনে ভয় পেলেও সময়ের সাথে সাথে ভয়টা পালিয়ে যাওয়ার মতো এখন পাওয়া এই ভয়ও পালিয়ে যাবে। রাতের আগে আর বাসায় ফেরা হবে না। ফ্যাসিবাদের দোসর পুলিশ আর আওয়ামী সন্ত্রাস লীগের সাথে ধাওয়া-পালটা ধাওয়া করতে করতে চাদরের মতো রাতের গাঢ় অন্ধকার নেমে পৃথিবীকে ঢেকে নেবে।

পুলিশ মেইন রোড থেকে নেমে এ পর্যন্ত আসার ভয়ও হচ্ছে। আতঙ্কে গলির ভেতর পায়চারি করছি। গুলির আওয়াজ শুনে সবাই হুড়মুড় করে গলিতে ঢোকার পরপরই মার্কেটের গেটগুলোও বন্ধ করে দিয়েছে। বেশির ভাগ দোকানগুলোর শাটারও। এই মুহূর্তে পুলিশ আসলে দৌড়ে মার্কেটের ভেতরে বা কোনো দোকানেও যাওয়া সম্ভব না। গুলি করলে নিশ্চিত গুলিবিদ্ধ হতে হবে বা অ্যারেস্ট। তারপর শুরু হবে জীবনের ভোগান্তি।

আতঙ্কে একটা ভ্যানের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। কী করব ভেবে পাচ্ছি না। শরীর আর কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে আছে। দৌড়াদৌড়ির কারণে হাঁপাচ্ছি। কিছুক্ষণ পর টিয়ারশেলের বিষাক্ত গ্যাস থেকে বাঁচার জন্য গায়ের শার্ট খুলে চোখ-নাক ঢাকা অবস্থায় একজন আন্দোলনকারীকে গলির ভেতরে আসতে দেখলাম, যার ডান হাতে এখনো লাঠি। গ্র্যাসের তীব্রতায় চোখ লাল হয়ে আছে। টপটপ করে পানি পড়ছে; খেজুর গাছের নল বেয়ে পড়া রসের মতো। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের অবস্থান জিজ্ঞাসা করলাম। বলল টিয়ারশেল আর গুলি করে আবার পেছনের দিকে চলে গেছে। এখন কোথায় জানি না। হয়তো ওভারব্রিজের নিচেই। একটু আশ্বস্ত হলাম। মনে হলো কাঁধ থেকে ভয়ের অনেক বড় একটা বোঝা নেমে গেল। ম্যাজিকের মতো শরীর ঘামাও বন্ধ হয়ে গেল।

ভিড় ঠেলে গলি থেকে বের হয়ে রাস্তায় থাকা আন্দোলনকারীদের সাথে মিশলাম; প্রথমবার গুলি আর টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে ধাওয়া দেওয়ার পর যারা সোজা মেইন রোড দিয়ে ঢালের নিচে নেমে গিয়েছিল। মেইন রোডে উঠার পরপরই সবাই মিলে ঢালের ওপর উঠলাম। একসাথে সবাইকে উঠতে দেখে আবার ধাওয়া দিয়ে ঢালের নিচেই নামিয়ে দিলো। পুলিশের সাথে আওয়ামী লীগের কিছু সন্ত্রাসীও যোগ হয়েছে। তারাও ছাত্রদের ধাওয়া করছে। সাথে ইট ছুড়ছে। মাথায় হেলমেট। হাতে লাঠি, রড আর ইট-পাটকেল। কোনো অস্ত্র ছিল কিনা দেখা যায় নি। পুলিশের করা ছররা গুলি কারও কারও গায়ে লাগলেও রেঞ্জের বাহিরে থাকার কারণে এখনো পর্যন্ত বড় কোনো হতাহতের চিত্র চোখে পড়ে নি। হয়তো প্রচণ্ড ব্যথা লেগেছে বা সামান্য ছিলে গেছে বা কারও কারও হয়তো আমার মতো সামান্য ব্যথা অনুভব হয়েছে।

গুলি আর টিয়ারশেলের বিষাক্ত ধোঁয়ার জন্য কেউই সামনে এগোতে পারছে না। পুলিশ ঢালের নিচে দাঁড়িয়ে থেকে আন্দোলনরত ছাত্রদেরকে ঢালের ওপরও যেতে দিচ্ছে না। দেখলেই অ্যাকশনে যাচ্ছে; ছররা গুলি, টিয়ারশেল আর সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ছে। তবুও কেউ কেউ লাঠি হাতে একাই সবার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশকে উদ্দেশ করে দিচ্ছে বিভিন্ন গালিগালাজ আর চিল্লায়ে বলছে, "সাহস থাকে গুলি ছাড়া আয়, দেখি কত বড় মরদ হইছোছ।"

আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী বাহিনীকে বলছে, "সাহস থাকে তো তোদের পুলিশ-বাপ ছাড়া সামনে আয়, দেখি কত বড় বাপের বেটা হইছোছ, হিজড়া শালারা।" আরও অকথ্য ভাষার বিভিন্ন গালিগালাজ।

পুলিশের ধাওয়া দিয়ে টিয়ারশেল ছুড়ার সে চিত্র যদি বর্ণনা করি—

সামনে টিয়ারশেলের শাদা ধোঁয়া, পেছনে রাস্তার ওপর জ্বলতে থাকা থোকায় থোকায় আগুন; টায়ার, কাঠ আর প্লাস্টিক পোড়া

কালো ধোঁয়ার সামনে হাতের লাঠিতে ঠেক দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন সাহসী ছাত্র-জনতা, সাহসী যোদ্ধা, যাদের পুলিশের গুলি বা টিয়ারশেলের কোনো ভয় নেই। কারও কারও হাতের লাঠিতে পতাকাও বাঁধা। (এ দৃশ্যের কিছু ছবি তুলা আছে)।

সে দৃশ্য কী যে ভালো লাগার ছিল! মনে হচ্ছিল যেন, এইসব সাহসী যোদ্ধাদের হাত ধরে আগামী প্রজন্মের জন্য সাহসের গল্প লেখা হচ্ছে। বা আমার সামনে স্থির হয়ে আছে এক টুকরো ফিলিস্তিন, যাদের জন্মই হয়েছে শত্রুর মোকাবিলার জন্য, সাহসিকতার জন্য, বুলেটের সামনে বুক টানটান করে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করার জন্য।

***

এখন কয়েক হাজার ছাত্র-জনতা রায়েরবাগ বাসস্ট্যান্ড থেকে শনির আখড়া ঢাল পর্যন্ত। পুলিশ ওভারব্রিজের নিচে দাঁড়িয়ে থেমে থেমে টিয়ারশেল আর ছররা গুলি ছুড়ছে। সাথে আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী হেলমেট বাহিনীর ইট-পাটকেল।

পালাক্রমে শুরু হলো দুই পক্ষের ধাওয়া-পালটা ধাওয়া আর ইট ছোড়াছুড়ি। সাথে কাপুরুশ পুলিশ ইটের বদলে ছুড়ছে পাটকেল, অর্থাৎ ছররা গুলি আর টিয়ারশেল। তাদের ছত্রছায়ায় ধেয়ে ধেয়ে এগিয়ে আসছে সন্ত্রাসী হেলমেট বাহিনী। ছাত্র-জনতা কয়েক হাজার হলেও সামনে ধাওয়া-পালটা ধাওয়া করছে হাতে গোনা গোটা পঞ্চাশেক মানুশ। তাদের মধ্যে আমিও একজন।

আন্দোলনের বেশির ভাগই ছাত্র। যাদের রক্ত গরম হলেও আগে কখনো এমন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে নি, গুলি বা টিয়ারশেলের মুখে পড়ে নি, সেজন্য ভয়টা একটু বেশিই। সামান্যতেই ভয় পেয়ে পেছন থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে। আর যারা সামনে আছি তাদের বেশির ভাগই আমজনতা বা লেখাপড়া না করা যুবক-শ্রেণি। দু-একজন বয়স্ক।

এই দীর্ঘ সময়ে একটা বিষয় খেয়াল করলাম, পুলিশ ধাওয়া দিলে একদম সামনে থাকা আমরা ১০ পা পিছালে, পেছনের প্রায় সবাই রাস্তা থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে। কিছু রায়েরবাগের দিকে চলে যাচ্ছে, কিছু মেইন রোডের পাশের রাস্তায় নেমে গলিও ভেতর চলে যাচ্ছে আর কিছু রাস্তার পাশের চায়ের দোকানগুলোর আড়ালে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। ছররা গুলি আর টিয়ারশেল ছুড়ে পুলিশ কিছুটা পিছু হটলে আবার তাদের দেখা মিলছে। এই দৌড়াদৌড়ির মাঝে সামনে থাকা কয়েকজন মিলে পেছনের সবাইকে নিয়ে একসাথে সামনে এগোনোর জন্য চেষ্টা করলাম; হাত উঁচু করে, উচ্চ আওয়াজে ডাক দিয়ে। যেন পুলিশ বা ছাত্রলীগ পিছু হটে। আমাদের চেষ্টা বৃথা হলো। আমরা এগোলেও পেছন থেকে কেউ এগোলো না। সবাই পেছনে দাঁড়িয়ে দেখছে। পুলিশ ছররা গুলি বা টিয়ারশেল নিক্ষেপ করলে আমরা একটু পেছালেই তারা আবার হইহই করে রাস্তা থেকে নেমে যাচ্ছে।

ছাত্ররা যখন পুলিশের ধাওয়া খেয়ে ভাটার পানি নেমে যাওয়ার মতো সবাই রাস্তা থেকে নেমে যাচ্ছে, তখন রাস্তার পাশে চায়ের দোকানে বসে থাকা বয়স্ক কাচা-পাকা চুল-দাড়ির কেউ কেউ বলছেন, "পেছনে না দৌড়ে তোমরাও ধাওয়া দাও। তোমরা ত হাজারখানেক। ওরা মাত্র কয়েকজন। তোমরা একবার ধাওয়া দিলে এদিকে আসার সাহস করবে না। পালটা ধাওয়া না দিয়ে সবাই এভাবে রাস্তা থেকে নেমে গেলে পুলিশ এখানেও চলে আসবে। তোমাদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেবে, তখন আন্দোলন বৃথা যাবে। আর রাস্তায় উঠতে পারবা না।" তার পর হাতে টুকরো টুকরো ইট ধরিয়ে দিয়ে বলছে, "সামনে যাও, ওদের ধাওয়া দাও।"

দাড়ি পাকা পাঞ্জাবি গায়ে দেওয়া একজন মুরুব্বির হাত থেকে টুকরো ইট নিয়ে আন্দোলনকারী একজনের হাতে দেওয়ার সময় হঠাৎ ঢালুর এপাশে টিয়ারশেল এসে পড়ল। সাথে সাথে সবাই নাক-মুখ ঢেকে রায়েরবাগের দিকে পেছানো শুরু করল। হাতের ইট ফেলে আমিও দৌড়ে রাস্তার পাশে এক চায়ের দোকানের আড়ালে গিয়ে

দাঁড়ালাম। পুলিশের গুলির ভয়, টিয়ারশেলের বিষাক্ত ধোঁয়া থেকে বাঁচার জন্য দৌড়াদৌড়ির মধ্যে কখন যে নিজেও আন্দোলনকারীদের একজন হয়ে গেছি বলতে পারি না। ভয় পেয়ে বাসায় চলে যাওয়ার কথাও আর মনে নেই। তারপর থেকে রাজপথেই ব্যস্ত সময় পার করছি।

একটু পর গ্যাসের বিষাক্ততা কিছুটা কমলে সামনের দিকে এগিয়ে আসার সময় চল্লিশোর্ধ্ব একজন লোককে দেখলাম টিয়ারশেলের গ্যাস থেকে আত্মরক্ষার জন্য আন্দোলনকারীদের মাস্ক দিচ্ছেন। আগে থেকেই আমার মুখে মাস্ক থাকায় নেওয়ার আগ্রহ হলো না। পাশ কাটিয়ে চলে আসার সময় হাত বাড়িয়ে কয়েকটা মাস্ক ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "সামনে যে চায় তাকে দিয়ো।"

পাশে আরও একজন দাড়ি পাকা মুরুব্বি সবাইকে পানি দিচ্ছেন; বিষাক্ত গ্যাস থেকে বাঁচতে চোখে-মুখে দেওয়ার জন্য।

মাস্ক হাতে সামনে ঢালের দিকে যাচ্ছি। টিয়ারশেলের শাদা গ্যাসের ভেতর দিয়ে শাদা টিশার্ট গায়ে একজনকে এদিকে আসতে দেখলাম। কাছে আসার পর দেখি চোখ-মুখ লাল হয়ে গেছে। হয়তো গ্যাসের কারণে। চোখ দিয়ে দরদর করে পানিও পড়ছে। পানি পড়ার কারণে ঠিকমতো তাকাতে পারছে না। তাকে ধরে রাস্তার পাশের দোকানে বসিয়ে চোখে-মুখে পানি দিয়ে জ্বলতে থাকা আগুনের কাছে নিয়ে বসিয়ে দিলাম। আগুনের তাপ নিয়ে গ্যাসের বিষাক্ততা কাটানোর জন্য।

দুপুরের সময় যখন আন্দোলনে আসি তখন কাজলা ব্রিজের নিচেই তার সাথেই কথা হয়েছিল। দূর থেকে তাকে সবার থেকে আলাদা করা যাচ্ছিল। তার অ্যাক্টিভিটি আর নেতৃত্বের কারণে। কাছে গিয়ে কথা বললেও নামটা শোনা হয় নি। ১৮/২০ বছরের টগবগে যুবক। হয়তো এখনো কলেজের গণ্ডিও পার করে নি। তবে আন্দোলনে তার লিডারশিপ আর দৃঢ়তা দেখে ভালো লেগেছিল সেজন্য কথা বলা শেষে কয়েকটা ছবিও তুলেছিলাম। গায়ের শাদা

টিশার্টে মার্কার কলম দিয়ে লেখা ছিল বিভিন্ন স্লোগান। বুকে লেখা ছিল—

"আমি বাঙালি
আমি বাঘ
আমার পিঠে রক্ত জয়ের দাগ-২০২৪"

পিঠে লেখা ছিল—
যারা বলে ইতিহাস জানি না,
১৯৫২/১৯৬৬/১৯৭১/১৯৯০ সালে কই ছিল মুখগুলো??

এই ধাওয়া-পালটা ধাওয়া আর দৌড়াদৌড়ির মধ্যে সূর্য বার্ধক্যে পৌঁছতে পৌঁছতে একসময় অন্ধকারের গর্ভে হারিয়ে গেল। এখন সন্ধ্যা। সামনে থাকা বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা হামলার জবাবে প্রতিবাদ শুরু করেছে চারপাশ ভাঙচুর আর জ্বালাও-পোড়াও দিয়ে। রাস্তার পাশে থাকা পুলিশবক্স, ভেতরে থাকা মালামাল, মুজিব, শেখ হাসিনার ছবি, চেয়ার আর বিভিন্ন জিনিশপত্র রাস্তার মাঝে এনে জ্বালিয়ে দিয়েছে। কেউ কেউ ছবিতে পা দিচ্ছে। জুতা দিয়ে পিষছে। কেউ কেউ হয়তো প্রস্রাবও করতে গেল।

***

চারপাশ অন্ধকারের চাদরে ঢেকে নিতে শুরু করেছে। পশ্চিমের আকাশে খণ্ড খণ্ড লাল মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। সূর্য ডুবে গেলেও আকাশ এখনো পুরোপুরি অন্ধকার হয় নি। রাস্তার এখানে-সেখানে সন্ধ্যার পর বাড়ির কোণে মিটিমিটি জোনাকিপোকার মতো আগুন জ্বলছে। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা হাতের কাছে যা পাচ্ছে এনে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। চারপাশ থেকে ভেসে আসছে ভাঙচুরের আওয়াজ। ঢাল থেকে নিচে নামলাম। দেখি কয়েকজনের হাতে টিয়ারশেলের

খালি খোসা, সাউন্ড গ্রেনেডের মুখ, ছররা গুলির ছোট-বড় লোহার বল। স্মৃতি হিশেবে বাসায় নিয়ে রেখে দেবে সেজন্য কুড়িয়েছে। আমিও দু-তিনটা নিয়ে পকেটে রেখে আরও নিচে নামলাম। যাত্রীছাউনি বরাবর।

এই মুহূর্তে ছাত্র-জনতার স্লোগানে শনির আখড়ার আকাশ কেঁপে কেঁপে উঠছে। পুলিশ নেই। মাগরিব পর্যন্ত গুলি, টিয়ারশেল আর সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে যাত্রাবাড়ীর দিকে পিছিয়ে গেছে। হয়তো থানায় চলে গেছে বা কাজলা মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারের টোল বক্সের কাছে গিয়ে বসে আছে, যেন আন্দোলনকারী বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা যাত্রাবাড়ী পর্যন্ত বা থানার সামনে যেতে না পারে।

পুলিশ চলে গেলেও সন্ত্রাসী আওয়ামী আর ছাত্রলীগ বাহিনী এখনো শেখদি আব্দুল্লাহ মোল্লা স্কুল এন্ড কলেজের গলির মুখে দাঁড়িয়ে আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুড়ছে। সাথে অকথ্য ভাষার গালিগালাজ। ওদিকে গলির বাম পাশের মসজিদে মাগরিবের নামাজ হচ্ছে। কয়েক বার দু-পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পালটা ধাওয়া হলো। কিছুক্ষণ পর ছাত্র-জনতা নিচেই নেমে একত্রে ধাওয়া দিলে পেছনে ফিরে পালায়ন করা কুকুর-শিয়ালের মতো তারাও গলির ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর আর ফিরে আসে নি।

মোবাইল বের করে দেখি ঘড়ির কাঁটা কখন যেন রাত নয়টার ওপর চলে গেছে। আর থাকা সম্ভব না। কাল আপিসে যেতে হবে। মায়াও বারবার ফোন দিয়ে বাসায় যেতে বলছে।

এখনো রাস্তার দুই পাশে ভাঙচুর, আগুন জ্বালানো আর বজ্র কণ্ঠের শুয়োর তাড়ানো স্লোগানে স্লোগানে প্রকম্পিত হচ্ছে শনির আখড়ার আকাশ-বাতাস। ইচ্ছা না থাকলেও বাসায় আসতে বাধ্য হলাম।

পর দিন আন্দোলনকারীদের একজনের কাছে রাতের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে বলল, "রাত নয়টার পর বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা হানিফ ফ্লাইওভারের টোল প্লাজা পর্যন্ত গিয়ে ভাঙচুর আর আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। তারপর স্লোগান দিতে দিতে ফ্লাইওভারের কাছে

চলে যায়। পুলিশ পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য আবার ছররা গুলি আর টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। ততক্ষণে অবস্থা আরও ভয়াবহ আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। দাবানলের মতো। বলা যায় পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে। পরিস্থিতি এত ভয়াবহ আকার ধারণ করে যে, রাতেই ঝরে যায় তরতাজা একটা প্রাণ। আহত হয় অর্ধশতাধিক। এ খবর পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী। এর বাহিরে আরও হতে পারে। কারণ, বর্তমান সব পত্রিকা আর টিভি চ্যানেলগুলো সরকারের দালাল। হাড় চাটা কুকুরের মতো। সত্য বলে না, সরকারের পা চাটা ছাড়া। তারা চায় না, তাদের প্রভুর আর তার পোষ্য সন্ত্রাসী বাহিনীর কুকীর্তি ফাঁস হয়ে যাক।

সামনে দেখতে পাব, শনির আখড়া, কাজলা, যাত্রাবাড়ী আর রায়েরবাগের আন্দোলন এখন আর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নেই। ছড়িয়ে পড়েছে সর্বস্তরের মানুশের মধ্যে। কারণ, গতকাল রাতে পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়া ছেলেটা কোনো ছাত্র ছিল না। গুলিস্তানে ব্যাটারির দোকানে কাজ করা একজন শ্রমিক। কাজ শেষে বাসায় ফেরার সময় গুলি লেগে মৃত্যুবরণ করে।

সামনের পরিস্থিতি দেখলে জানব, এই এলাকাগুলোতে আমার দেখা আহত এবং মৃতের সংখ্যায় আমজনতারই এগিয়ে থাকবে। পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকা মানুশের মধ্যে ছাত্ররা থাকলেও আমজনতা, রাস্তার টোকাই, শ্রমিকশ্রেণির মানুশ বেশি থাকবে। সেজন্য তাদের আহত-নিহতের সংখ্যার বর্ণনা বেশি আসবে।